গ্রীক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ড. এলহাম হোসেন

গ্রীক সাহিত্য, দর্শন ও পৌরাণিক কাহিনী হাত ধরাধরি করে চলে। হোমার থেকে যাত্রা শুরু করে মোটামুটিভাবে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের উত্থান পর্যন্ত অর্থাৎ চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত এর অগ্রযাত্রা অব্যহত থাকে। বলা হয়ে থাকে, প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও হীব্রু ভাষায় রচিত বাইবেল পশ্চিমা সাহিত্যের জন্ম ও বেড়ে ওঠার রসদের যোগান দেয়। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের অঙ্গ-সৌষ্ঠব্য তৈরি করে মহাকাব্য, গীতি কবিতা, বিয়োগান্তক নাটক, মিলনাত্মক নাটক। গ্রীক সাহিত্যের উপাদানের যোগান দেয় গ্রীকদের মধ্যকার প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, পৌরাণিক গল্প যা লোকমুখে ফিরছিল, যুদ্ধের কাহিনী ও কৃষিকাজ সংক্রান্ত বিষয়। গ্রীকদের জীবনে দু'টি প্রধান কাজ ছিল তখন– একটি কৃষিকাজ যা জীবন নির্বাহের জন্য জরুরি, অপরটি ছিল যুদ্ধ করা যা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তার জন্য ছিল অপরিহার্য। দেবদেবীর পূজা-অর্চনা ও তাদের জন্য মন্দির নির্মাণ এবং বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযাত্রিক কাজে দেবত্বের ধারণ করা গ্রীকদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে ছিল। তাদের ধর্ম ছিল কিন্তু ধর্মগ্রন্থ ছিল না। ফলে দর্শন ও নন্দনতত্ত্বের চর্চা তাদের জীবনকে ব্যাপকভাবে আলিঙ্গন করে। জীবনের নানান পর্যায়, নানান উপষঙ্গকে তারা দার্শনিকপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করার অনুকূল পরিবেশ বিরাজমান ছিল গ্রীকদের জীবনে। দর্শন, নন্দন, বিজ্ঞান ও ধর্মীয় বিষয়াদির মাখামাখি অবস্থানই সমৃদ্ধ গ্রীক সাহিত্যের শরীরে রক্ত সঞ্চার করে।

গ্রীক সাহিত্য নিয়ে আলোচনার শুরুতেই যে বিষয়টি চলে আসে, তা হলো মহাকাব্য। আমাদের এই উপমহাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল অনুসন্ধান করতে গেলে যেমন আমরা *মহাভারত* ও *রামায়ণের* কথা বলি, ঠিক তেমনি গ্রীক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শুরুতেই আমাদের সামনে আসে *ইলিয়াড*, *ওডিসি* এবং এই দুই কালজয়ী মহাকাব্যের স্রষ্টা হোমারের নাম। কেউ কেউ বলেন, হোমার নাকি অন্ধ ছিলেন। 'হোমেরাস' শব্দের অর্থ হলো 'অন্ধ'। তাই হোমার নামটি নাকি নির্দেশ করে যে, হোমার অন্ধ কবি ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, হোমার একক কোনো কবি ছিলেন না। আসলে একগুচ্ছ কবিকে বলা হয় হোমার। হোমারের পরিচয় নিয়ে বিতর্ক যাই থাক না কেন, *ইলিয়াড* এবং *ওডিসি* গ্রীক সাহিত্য শুধু নয়, বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

ইলিয়াড আগাগোড়াই বিয়োগান্তক মহাকাব্য। এর শুরুতেই হোমার ঘোষণা করেছেন এর মূল বিষয়বস্তু। গ্রীক মহাবীর একিলিসের ক্রোধই এই মহাকাব্যের মূল বিষয়বস্তু। দেবী থেটিস ও রাজা পেলেউসের পুত্র একিলিস। সে-ও ছিল হেলেনের পাণিপ্রার্থী। তাই শর্তানুযায়ী হেলেনের উদ্ধার-অভিযানে সে যোগ দেয়। ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস হেলেনকে ফুসলিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। হেলেন ছিল বিবাহিত। স্পার্টার রাজা মেনেলাসের স্ত্রী সে। মেনেলাসের অনুপস্থিতিতে প্যারিস হেলেনকে অপহরণ করে ট্রয়ে নিয়ে এসেছে। হেলেনের উদ্ধার অভিযানে যোগ দিয়েছে এক হাজার যুদ্ধ জাহাজ আর দশ হাজার সৈন্য। এরা দশ বছর ধরে চারপাশে উঁচু প্রাচীরে ঘেরা ট্রয় নগরীকে অবরোধ করে রাখলেও যুদ্ধে জিততে পারে না। এর অন্যতম কারণ ছিল একিলিসের রাগ ও অভিমান। তাকে অপমান করেছে এই যুদ্ধের সেনা নায়ক এগামেমনন। দেবতা এপোলোর নির্দেশে ক্রেসেইসকে তার বাবার কাছে ফেরত দিতে বাধ্য হলেও একিলিসের উপপত্নী ব্রেসেইসকে সে ছিনিয়ে নিয়েছে। তাই একিলিস অপমানিতবোধ করেছে। করবেই তো, সে তো সাধারণ কোনো মানুষ নয়। যুদ্ধে আসার আগেই তার মা দেবী থেটিস তাকে বলেছিল, সে যদি যুদ্ধে যায়, তবে তার জীবন হবে সংক্ষিপ্ত কিন্তু গৌরবময়। অপরপক্ষে, যুদ্ধে না গেলে তার জীবন হবে দীর্ঘ কিন্তু

গৌরবহীন। একিলিস গৌরবের সংক্ষিপ্ত জীবনকেই বেছে নিয়েছিল। এখানেই সে বীর। বীর তো মরে না, সে ধ্বংস হয়। মরে তো কাপুরুষেরা।

একিলিসের অনুপস্থিতিতে গ্রীকরা ট্রয়ের রাজপুত্র মহাবীর হেক্টরের সামনে সুবিধা করে উঠতে পারেনি। মার খেয়েছে। হতাশ হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ দেশে ফিরে যাবার প্রস্তাবও করেছে। সবাই মিলে একিলিসের কাছে গিয়ে অনুনয়-বিনয় করেছে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য। এক পর্যায়ে একিলিস নিজে না গিয়ে বন্ধু পেট্রক্লাসকে যুদ্ধে পাঠায়। দুর্ভাগ্যক্রমে সে হেক্টরের হাতে মারা পরে। তখন ক্রোধ এবং তার বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা একিলিসকে প্রাণিত করে যুদ্ধে নামতে। যুদ্ধে হেক্টরকে সে বধ করে। হেলেন উদ্ধার হয়। ওডিসিয়াসের কাঠের ঘোড়ার কৌশল বুঝতে ব্যর্থ হয়ে ট্রজানরা গ্রীকদের হাতে ধ্বংস হয়।

এভাবে দেখা যায় হোমারের *ইলিয়াড* এক অমর বীরগাঁথা। এটি শুধুই যে একটি সাহিত্যকর্ম তা নয়। এর আছে ঐতিহাসিক তাৎপর্য। এই মহাকাব্য অতিলৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে মরণশীল মানুষের যে যুদ্ধ বা সংঘাতের চিত্র হোমার অংকন করেছেন, তার মধ্য দিয়ে রূপকালঙ্কারের মাধ্যমে নিয়তির সঙ্গে মানুষের চিরন্তন সংঘাতের চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ জানে সে নিয়তিকে জয় করতে পারবে না, তবুও নিয়তির সঙ্গে সে সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত। মানুষ জানে মৃত্যু অনিবার্য, তবুও সে বাঁচার লড়াইয়ে মরে। দিনে একবার খেলেও মানুষ বাঁচে। কিন্তু মানুষ তো দিনের মধ্যে কয়েকবার খায়। মানুষ জানে তার সর্বশেষ পরিণতিতে খুব সামান্য জায়গারই প্রয়োজন হয় তার শবের শেষাশ্রয়ের জন্য, তবুও সে সুপ্রশস্ত ঘর বানায়। এই যে নিয়তিকে অমোঘ জেনেও মানুষ যে নিয়তির বিরুদ্ধেই নিজেকে স্থাপন করেছে, এ জন্যই তো সভ্যতার চাকা ঘুরছে। এছাড়া *ইলিয়াডে*র কাহিনী বিশ্লেষণে তৎকালীন গ্রীক সমাজকাঠামো, নারীদের অবস্থান, মানুষের মনস্তত্ব ও সামাজিক অবস্থানের এক বিশ্বাসযোগ্য চিত্র নন্দনের সাহচর্যে প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে এই মহাকাব্যে।

হোমারের আর একটি মহাকাব্য হলো *ওডিসি*। এটি রচিত হয় খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে। এটি আংশিকভাবে *'ইলিয়াডে'র* সিকুয়েল। এটিও বীর গাঁথা। ইলিয়াডের কাহিনী যেখানে শেষ হয় সেখান থেকেই ওডিসির কাহিনী শুরু হয়। সমুদ্রদেবতা পোসাইডনের ক্রোধের শিকার হয়ে ওডিসিয়াস বা ইউলিসেস দশ বছর দিক হারিয়ে নানান প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে। এদিকে তাঁর অবর্তমানে বিশ বছর ধরে তাঁর বাড়িতে আস্তানা গেঁড়েছে একশত আটজন পাণিপ্রার্থী। ওডিসিয়াসের স্বতী-সাধ্বী স্ত্রী পেনেলোপিকে তারা চাপ দিচ্ছে এদের মধ্যকার একজনকে বিয়ে করতে। ওডিসিয়াসের পুত্র টেলেমেকাসের বয়স প্রায় বিশ বছর। পিতার মতই স্থিতধীসম্পন্ন। ওডিসিয়াস ফিরে আসার পর পিতাপুত্র মিলে পাণিপ্রার্থীদের হত্যা করে ইথাকাকে মুক্ত করে।

এ-কথা সর্বজনবিদিত যে, একটি মহাকাব্য একটি জাতির মেধা, মনন, রুচি, শিল্পবোধ, নন্দন ও দর্শনের নির্যাসে সিক্ত ও সৃজনশীল কল্পনার অত্যন্ত উচ্চমানের সৃষ্টি। এতে ইতিহাসের প্রভূত উপাদান থাকে। সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব এর পরতে পরতে লেপ্টে থাকে। তবে মহাকাব্য ইতিহাস নয়, দর্শন নয়, বিজ্ঞান নয়। এ কথা তো সবারই জানা যে, এরিস্টটলই প্রথম 'দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি তত্ত্বসর্বস্ব রচনা থেকে সাহিত্য-শিল্পকে পৃথক করেছেন এবং এ-কাজ করেছেন এই কথা বলেই যে, সাহিত্যশিল্পের কাজ রূপায়ণ, জীবনের অনুকরণ' (ভট্টাচার্য ১৪০)। একটি মহাকাব্যে ঘটনা, ক্রিয়া, চরিত্র, বিষয়ভাবনা ইত্যাদি থাকে। এগুলো খণ্ড খণ্ড অনুকরণে একটা সমবায়ী বা ঐক্যবদ্ধ জীবনচিত্রের রূপায়ণ ঘটে। এটি পৃথিবীর সব মহাকাব্যেই ঘটে এবং মহাকাব্যগুলো কালের স্রোতেও অক্ষত রয়ে যায়, কারণ এগুলোর উপষঙ্গগুলোর অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে কবির হৃদয়াবেগের সংযোগ ঘটে যা একে যান্ত্রিকতা দেয় না, দেয় সর্বজনীনতা। হোমারের *ইলিয়াড*-এ যুদ্ধের অনুকরণ আছে।

তবে তাতে ভুক্তভোগী মানুষদের যে বিলাপ, বিশেষ করে নারীদের যে অসহায় হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে তা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বিরোধী বাণীরই প্রচার করে। যুদ্ধের বিজয়ী পক্ষ বীরত্বের দাবি করতেই পারে কিন্তু পরাজিত পক্ষের যে করুণ পরিণতি, যে হাহাকার, যে কান্না- তা সবার কাছেই মর্মভেদী। নিজেরই জ্ঞাতি ভাইদেরকে হত্যা করে যদি বীরত্ব অর্জন করতে হয়, তবে সে বীরত্বের প্রয়োজন নেই। সর্বোপরি, যুদ্ধ মানব সভ্যতার জন্য কখনই কল্যাণ বয়ে আনে না। এটি শুধু বিশ্বকে উপহার দেয় লাশ আর ধ্বংসযজ্ঞ। তাই এটির বর্জনই মানব জাতির জন্য শ্রেষ্ঠ পন্থা।

যা'হোক, কাব্যভাবনা, গুরুগম্ভীর রীতি ও প্রকরণের ব্যবহারের দিক থেকে হোমারের সমতুল্য কবি তাঁর সময়ে কেউ না থাকলেও আর একজন কবির কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন হেসিয়ড। হোমার যেখানে অতীতের বীরগাঁথা তৈরি করেছেন হেসিয়ড তৈরি করেছেন তার সময়ের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের জীবনচিত্র। হেসিয়ডের *ওয়ার্কস অ্যান্ড ডেইজ* এবং *থিওগোনি* কালের বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য চিত্র হিসেবে গ্রীকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। *ওয়ার্কস অ্যান্ড ডেইজ*- এ গ্রীসের দারিদ্র্যপীড়িত স্বেদসিক্ত কৃষকদের অতি সাধারণ ও বেঁচে থাকার সংগ্রামের চিত্র অংকিত হয়েছে। পক্ষান্তরে *থিওগোনি*তে সৃষ্টি ও স্রস্টার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। তবে হেসিয়ডের কাব্যে অতি প্রাকৃতিক দেবদেবীর উপস্থিতিতি থাকলেও সেখানে মানুষই অতিমানবকে ছাপিয়ে গেছে। গ্রীকদের কাছে হোমার ও হেসিয়ড উভয়ই ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

এঁদের পাশাপাশি, বিশেষ করে, খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে পঞ্চম শতক পর্যন্ত লিরিক বা গীতিকবিতার বেশ চর্চা ছিল গ্রীকদের জীবনে। এদের প্রত্যাহিক জীবনের বিষয়াশয়, সুখ, দুঃখ, প্রেম, বেদনা ইত্যাদির উপস্থাপনা মূর্ত হয়ে ওঠে গ্রীক গীতিকবিতায়। কবির ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিই হলো গীতিকবিতার অন্তঃপ্রাণ। তবে গীতিকবিতা লেখা হতো গ্রীকদেরই প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষায়। এতে অবশ্য জীবনের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠতা বাড়তো। এরপর এটি আবৃত্তির সময় লায়ার নামক এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র বা বাঁশি বাজানো হতো। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, এই লায়ার (Lyre) থেকে *লিরিক* শব্দের উৎপত্তি। প্রাচীন গ্রীসের গীতি কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্যাফো নামের একজন মহিলা কবি, আর একজন পিন্ডার। এদের রচনার বেশি কিছু বর্তমানে পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকুও ছড়ানো-ছিটানো। এগুলোর বিষয়বস্তু মূলত বীরগাঁথা, সম্ভ্রান্ত মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ, সৈন্যদের জয়গান ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য।

এবার আসা যাক নাটকের আলোচনায়।

সাহিত্য বুৎপত্তি সম্পন্ন কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এমন চারজন ট্রাজেডি রচিয়িতার নাম বলুন যাঁরা আপন সৃষ্টির মহিমায় বিশ্বসাহিত্যে সমুজ্জল ও অমর হয়ে আছেন। তবে তিনি অকপটে উত্তর দেবেন, এঁরা হলেন ঈস্কিলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস ও উইলিয়াম শেক্সপীয়ার। এঁদের প্রথম তিজনই গ্রীক নাট্যকার এবং চতুর্থ জন ইংরেজ। প্রথম দুইজন গ্রীক নাট্যকার শেক্সপীয়ারের চেয়ে কোনো অংশে কম নন প্রতিভার দিক দিয়ে, বরং ঈস্কিলাস নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ।

আর বিশ্বের দুজন শ্রেষ্ঠ কমেডি রচয়িতার প্রথমজন হলেন এরিস্টোফেনিস, যাকে প্রাচীন গ্রীসের সর্বপ্রথম সাহিত্য সমালোচকও বলা হয় এবং অপর জন হলেন সপ্তদশ শতকের মলিয়ার (ফরাসী লেখক)। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, উল্লেখিত বিশ্বসেরা তিনজন ট্রাজেডি লেখক ও একজন কমেডি নাট্যকারদের সবাই খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের লেখক। আসলে বিশ্বসাহিত্যে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এথেন্সের অবদান সত্যিই বিস্ময়কর। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, সংগীত-ভাস্কর্যে, চিন্তা-ভাবনায়, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়, মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনে এবং মানবিক মূল্যবোধ নির্ণয়ে এথেন্সের অবদান

মানব সভ্যতার ইতিহাসে অতুলনীয়। এথেন্সে খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ট্রাজেডি ও কমেডির চরম উৎকর্ষ সাধিত হলেও এর মূলে রয়েছে কয়েক শতকের ঐতিহ্য।

ট্রাজেডি ও কমেডি-এই দুই শ্রেণির নাটকের মূলেই প্রোথিত আছে গভীর ধর্মবিশ্বাস। গ্রীক নাটক একান্তভাবে ধর্মবোধ প্রসূত। শস্য, সুরা ও উর্বরতার দেবতা হলো ডায়োনিসাস। এই ডায়োনিসাসের পূজা থেকেই ট্রাজেডি ও কমেডির উৎপত্তি। গ্রীক মিথোলোজি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ডায়োনিসাস ন্যাসা পর্বতে মদিরা আবিষ্কার করে। আর এই সূরা বা মদিরা আবিষ্কারের জন্যই সে গ্রীকদের দ্বারা পূজিত হয়। ডায়োনিসাসের অপর আর একটি নাম আছে– আর তা হলো বাক্কাস।

বাক্কাসের অনুচররা দেখতে অর্ধেকটা ছাগের আকৃতির। এদেরকে স্যাটার বলা হতো। এইসব অনুচর নিয়ে ডায়োনিসাস সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াত এবং মদ্য পানে মত্ত হত। সারা দুনিয়া চষে বেড়ানোর পর এরা আসে আর্গসে। আর্গস এমন একটা অঞ্চল যেখানে প্রাচীন এথেন্সের নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর্গসে এই নবীন দেবতার উদ্দেশ্যে মন্দির তৈরি করে নৃত্যগীতের আয়োজন করা হয়। লোকজন সমবেত হয়ে ডায়োনিসাসের পূজো করত এবং সমস্বরে গান গাইত। এই গান থেকেই ডিথিরাম্বের উদ্ভব হয়।

মনে রাখা আবশ্যক যে, এই ডিথিরাম্বকে সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না যদিও পরবর্তীকালে নাটক সৃষ্টির ব্যাপারে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ডিথিরাম্বকে যে কারণে সাহিত্য বলা হয় না তা হলো এটা লিখিত নয় এবং আঙ্গিকের দিক দিয়ে এটি সুগঠিত ও সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেনি। ডিথিরাম্ব একটি নির্দিষ্ট রূপ পায় যথাসম্ভব খ্রি. পূ. ৬ষ্ঠ শতকে যখন করিন্থের কবি এরিয়ন এ ব্যাপারে মনোযোগ দেন। এই ডিথিরাম্ব পঞ্চাশ জন গায়ক মিলে গাইত। এই গায়ক দলই কোরাস নামে পরিচিত। এটা কালক্রমে এথেন্সে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই কোরাসের একজন নেতা থাকত। একে এগজারকস বলা হয়।

আসলে এরিয়নের ডিথিরাম্ব থেকেই ট্রাজেডির উদ্ভব। কেউ কেউ এই কোরাসকে ট্রাজেডির নিউক্লিয়াস বা প্রাণকেন্দ্র বলেছেন। আমরাও যদি এদের সঙ্গে সুর মিলাই তবে দোষ নেই, কারণ এ কথা সত্য। ডিথিরাম্ব ও ট্রাজেডি দুটি সমানতারে চলে বেশ কিছুদিন। কিন্তু কালক্রমে এই ডিথিরাম্ব দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়– একটি নৃত্যগীত সমৃদ্ধ এবং অপরটি নাট্যরস সম্বলিত। কালক্রমে দেখা যায় যে, এথেন্সে নাট্যগীত সম্বলিত ডিথিরাম্বের চেয়ে নাট্যধর্মী ডিথিরাম্ব অধিক থেকে অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। যদিও ডিথিরাম্বে ডায়োনিসাসের বিচিত্র কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়, তথাপি ধীরে ধীরে গ্রীক পুরাণের কাহিনী নিয়ে নাটক, বিশেষ করে ট্রাজেডি রচিত হতে থাকে।

ট্রাজেডির উৎস খুঁজতে গেলে আমরা দেখব, এই ডিথিরাম্ব থেকেই ট্রাজেডির উৎপত্তি। এরিস্টটলও তাই মনে করেন। যদি আর একটু গভীরে যাই তবে দেখা যায়, গ্রীক শব্দ ট্রাগেডিয়া (Tragoidia) বা (Goat Song) থেকে ট্রাজেডির উৎপত্তি ঘটেছে। আসলে গ্রীক শব্দ *ট্রাগোস* এর অর্থ হলো ছাগ। ধারণা করা হয় যে, ডিয়োনিসাসের মন্দিরে কোরাস ছাগ-চর্ম পরিধান করে নৃত্যগীতে লিপ্ত হতো। এরা দেবতার উদ্দেশ্যে একটি ছাগও বলি দিত। যেহেতু একটি জীবের প্রাণ হরণ করা হতো, তাই ডিথিরাম্বের সুর হতো করুণ। আর এই করুণ সুর থেকেই উদ্ভব হলো করুণ রসের নাটক ট্রাজেডির। ট্রাজেডির সূচনালগ্নে ট্রাজেডির সঙ্গে ছাগের একটা নিবির সম্পর্ক ছিল। এমনও হতে পারে যে, ছাগ হচ্ছে কামনা ও উর্বরতার প্রতীক আর ডায়োনিসাস হচ্ছে উর্বরতার প্রতিভূ।

যাই হোক ট্রাজেডি যার হাতে রূপ লাভ করে সে আর কেউ নয়, সে হলো থেসপিস। থেসপিস এটিকার একারিসার অধিবাসী যেখানে ডায়োনিসাসের পূজো হতো। থেসপিস সর্বপ্রথম একটি চরিত্রের অবতারণা করেন নাটকে। তিনি নিজেই কোরাসনেতার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। প্রথমে

মুখে রং মেখে অভিনেতারা অভিনয় করতেন। পরে অভিনেতারা কাপড়ের মুখোশ পড়ে অভিনয় করতেন।

অতপর ঈস্কিলাস ট্রাজেডিকে আরো সমৃদ্ধ করেন আরো একটি চরিত্রের অবতারণার মধ্য দিয়ে। ঈস্কিলাসের নাটকের ঘটনাগুলো যে বিষয়টি আলোচনা করতে চাইত তা হলো পাপ (Sin) ও শাস্তি। যেহেতু পাপের শাস্তি একটি নাটকের সীমিত পরিসরে দেখানো সম্ভব নয়, তাই ঈস্কিলাস তিনটি করে ট্রাজেডি একসঙ্গে লিখতেন। এট্রেউস তার ভাই থায়েস্টিসকে তার নিজ সন্তানের মাংস খাইয়ে যে পাপ কওে, তার প্রায়শ্চিত্ত করে তার পুত্র এগামেমনন । সে প্রাণ হারায় তারই স্ত্রী ক্লিটেমনেস্ট্রার হাতে। স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বামীকে হত্যা করার জন্য সে যে পাপ করলো তার শাস্তি দেয় অরিস্টিস, ক্লিটেমনেস্ট্রারই ছেলে। আবার অরিস্টস যেহেতু মাতৃহত্যা করে পাপ করল, তার জন্য তাকে নেয়া হলো এপোলোর দরবারে যেখানেব সে ক্ষমা পেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে বংশ পরস্পরের বর্তিত পাপের স্খলন বা সমাপ্তি হলো। আসলে ঈস্কিলাসকেই সত্যিকার অর্থে ট্রাজেডির স্রষ্টা বলা যায়।

সফোক্লিস ট্রাজেডিতে আরো একটি চরিত্রের অবতারণা করেন। তাঁর অমর সৃষ্টিগুলোর মধ্যে *কিং ঈডিপাস* নাটকটি উল্লেখযোগ্য। মানুষ যে নিয়তির হাতের ক্রিড়ানক তা এই নাটকে মর্মান্তিকভাবে ফুটে উঠেছে। ঈডিপাস যতই সংগ্রাম করে ভাগ্যকে পাশ কেটে চলার, যতই অস্ফালন করে নিয়তির অমোঘ বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতে, ততই সে মারাত্মকভাবে জড়িয়ে পড়ে নিয়তির জালে। তাই বলে মানুষ যে নিয়তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না তা নয়। কে-না জানে যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই বলে কি সবাই মরার আগেই মরার ভয়ে খাওয়া, ঘুম, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে? না। মানুষ নিয়তিকে অমোঘ জেনেও নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করে। আর যুদ্ধ করে বলেই সভ্যতার চাকা আজও ঘুরছে। কবর সাড়ে তিন হাত বলে আমরা বাস করার জন্য সাড়ে তিন হাত বাড়ি তৈরি করি না। এটাই তো নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই চরম সত্যটি মহাকবি হোমারের *ইলিয়াডে*ও উদ্ভাসিত হয়েছে।

গ্রীক নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ইউরিপিডিসের ভূমিকা কম নয়। তাঁর বিখ্যাত নাটক *মিডিয়া* ও *হিপ্পোলিটাস* -এ তিনি যে হিউম্যান সাইকোলোজির পর্যালোচনা দেখিয়েছেন তা অনবদ্য।

কমেডি হলো নাট্যসাহিত্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। 'কমেডি' কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ Komoidia থেকে। এর অর্থ একদল হৈহুল্লোরকারীর গান। ডায়োনিসাসকে উপলক্ষ্য করে গ্রামের লোকজন যে হৈহুল্লোর করে বেড়াতো তাকে Komos বলা হতো। প্রথম দিকের কমেডিতে ভাঁড়ামি, লোকজনকে বাক্যবাণে বিদ্রূপ করা, অশ্লীলতা ইত্যাদির আধিক্য দেখা যায়। তবে এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ডায়োনিসাসের সন্তুষ্টি লাভের মধ্য দিয়ে প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জমির উর্বরতা অর্জন। এথেন্সে বসন্ত উৎসবে ট্রাজেডি অভিনয়ের রীতি খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতাব্দি থেকে দেখা যায়, আর কমেডি অভিনয়ের সুযোগ লাভ করে ৪৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কমেডি সাধারণত শীত উৎসবে অভিনীত হতো। তবে উল্লেখিত শতকের শেষে শীত উৎসবে ট্রাজেডিও অভিনীত হতো।

এ কথা স্মার্তব্য যে, এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকারেরা যতটা প্রভাবান্বিত হয়েছেন গ্রীক নাটক দ্বারা বা গ্রীক নাট্যকারদের দ্বারা, তারচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত হয়েছেন রোমান নাট্যকার সেনেকার দ্বারা। সর্বকালের কুখ্যাত রোমান সম্রাট নেরোর গৃহশিক্ষক ছিলেন এই সেনেকা। সেনেকা যখন নাট্যকার, তখন রোমান নাটকের ডিকাডেন্ট পীরিয়ড চলছিল।

এরিস্টটল তার পোয়েটিক্সে ট্রাজেডির যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এবং ট্রাজিক হিরোর যে স্বরূপ নির্ণয় করেছেন, তা এলিজাবেথীয় যুগের ট্রাজেডির সঙ্গে পুরোপুরি মিলে না। এরিস্টটলের মতে ট্রাজেডিতে কমিক দৃশ্য বা কমেডিতে ট্রাজিক দৃশ্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু এলিজাবেথের যুগের

নাটকে আমরা এই দুয়ের মিশ্রণ দেখি। আসলে নাটক যদি জীবনের প্রতিরূপ হয়, আর জীবন যদি সুখ-দুঃখের সহাবস্থান হয়, তবে কেন তাতে ট্রাজিক ও কমিক দৃশ্যের মিশ্রণ থাকবে না? তবে ট্রাজেডিতে এত বেশি কমিক দৃশ্য থাকা চলবে না, যাতে সেটা ট্রাজিক এটমোস্ফীয়ারকে বা গাম্ভীর্যকে বিঘ্নিত না করে। আমরা শেক্সপীয়ারের নাটকে ট্রাজিক ও কমিক দৃশ্যের এক অনবদ্য সমন্বয় দেখি। শেক্সপীয়ার এতই যত্নসহকারে কমিক দৃশ্যকে ট্রাজেডিতে এনেছেন যে, আমরা মনে করি এমনটি ঠিক এই পরিস্থিতিতে থাকা মন্দ নয় এবং এটা ট্রাজেডির গাম্ভীর্যও খর্ব করে না। এজন্যই হয়তো ড্রাইডেন বলেছেন যে, এরিস্টটল যদি শেক্সপীয়ারের নাটক দেখতেন, তবে হয়তো ট্রাজেডির সংজ্ঞা অন্যভাবে লিখতেন।

গ্রীক যুগের কমেডির ধারণা আধুনিক যুগের কমেডির ধারণার সঙ্গে মিলে না। প্রাচীনকালে কমেডির উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে হাসানো। এজন্য কমেডিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঠাঁই পেত। কমেডিতে মানুষকে হেয় রূপে উপস্থিত করা হতো। কিন্তু আধুনিককালে কমেডির উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আনন্দ দেয়া। হাসি আর আনন্দ এক জিনিস নয়। স্যার ফিলিপ সিডনি হাসি আর আনন্দের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন তার *Apology For Poetry* তে। একটা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের আনন্দ দেয়, কিন্তু হাসির উদ্রেক করে না। অন্যক্ষেত্রে একজন পণ্ডিত ব্যক্তির বোকামি হাসির উদ্রেক ঘটায়, কিন্তু আনন্দ দেয় না। বরং তাঁর জন্য মায়ার উদ্রেক ঘটে। শেক্সপীয়ারের কমেডিগুলো পড়ে আমরা মূলত আনন্দ পাই। আমরা যদি হাসি তবে সেটি অতিরিক্ত পাওয়া হবে।

গ্রীক যুগের ট্রাজেডি ও কমেডির মঞ্চায়ণের পার্থক্য ছিল। প্রাচীন গ্রীক যুগে নাটকগুলো মঞ্চস্থ হতো সাধারণত পাহাড়ের উপত্যকায়। পাহাড়ের গা কেটে কেটে দর্শকদের বসার আসন তৈরি করা হতো। ট্রাজেডি নাটকে অভিনেতারা মুখোশ ছাড়াও বিশেষ পোষাক পড়তো। এই পোষাক ছিল জাঁকজমকপূর্ণ। ঈস্কিলাসের সময় চালু হয় লম্বা জোব্বা। মাথায় বিশেষ ধরনের বেনী করা হতো। একে Onkos বলা হতো। ট্রাজেডিতে অভিনেতারা এক ফুটেরও উঁচু জুতা পড়তো। কিন্তু কমেডিতে এসবের বালাই ছিল না। ট্রাজেডি ভাবগম্ভীর নাটক, আর তাই ট্রাজেডির অভিনেতারা সম্ভ্রমপূর্ণ। আর কমেডির অভিনেতারা ভাঁড়। ট্রাজেডির অভিনেতারা প্যাড পড়ত শরীরটাকে মোটা করে দেখানোর জন্য, যাতে দূর থেকে দর্শকরা দেখতে পান। কিন্তু কমেডিতে এসবের বালাই ছিল না। আসলে একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রাচীন গ্রীকরা বিশ্বাস করতো যে, ট্রাজেডি কেবলমাত্র গম্ভীর প্রকৃতির এরিস্টক্রাট্স (Aristocrates) দের জন্য এবং কমেডি হলো গ্রামীণ লঘু মনের মানুষদের জন্য। এরা সারাদিন ক্ষেতে-খামারে কাজ করত আর সন্ধ্যায় বিনোদনের জন্য নাটক দেখত।

যা'হোক, গ্রীক সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব্য তৈরি হয়েছে সাহিত্যেকদের ঘনিষ্ঠ জীবনদর্শন, উপলব্ধি, ধর্মানুভূতি, জীবনাচার ও নীতিশাস্ত্রের নির্যাসের দ্বারা। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় গ্রীকদের মধ্যে দর্শন চর্চার অস্তিত্ব খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে শুরু হয়। এরপর থেকে এই চর্চা সক্রেটিস, প্লোটো, আরিস্টোটল ও আরো অনেক দার্শনিকের মধ্যে বিস্তৃত হয়। তবে গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে সক্রেটিস, প্লোটো ও অ্যারিস্টোটলই তিন প্রধান স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হন। পশ্চিমা জ্ঞানচর্চার ওপর এঁদের প্রভাব প্রভূত। সক্রেটিস যদিও নিজে কিছু লেখেননি, তবুও চারপাশের জীবন-জগতের ব্যাপারে তাঁর যে কৌতুহল এবং তা মেটানোর জন্য প্রশ্ন করে জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তিমূলে পৌঁছার যে কলা তিনি সূত্রপাত করেন, তাই মূলত দর্শনের ভিত্তি তৈরি করেছে। এরপর তাঁর ছাত্র প্লেটো সক্রেটিসের দর্শন কৌশল ডায়ালগ বা আলাচারিতা হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন তাঁর অমর গ্রন্থ *রিপাবলিকে*। পরে প্লেটোর ছাত্র অ্যারিস্টটল দর্শনশাস্ত্রকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করেন। তাঁর *মেটাফিজিক্স* দর্শনশাস্ত্রের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ। এর প্রথম বাক্যটা হলো, 'সব মানুষই প্রকৃতিগতভাবে জানতে চায়।' জানার কৌতুহলই

দর্শনশাস্ত্রের মূল কথা। পরবর্তীতে গ্রীস, পশ্চিমাবিশ্ব ও মুসলিম দার্শনিকদের ওপর এই গ্রন্থের প্রভাব প্রভৃত। অ্যারিস্টটল দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, নন্দন ইত্যাদির বিশদ বিশ্লেষণ করেন। প্লেটোর প্রকরণ তত্ত্বের ওপর অ্যারিস্টটলের বিশদ আলোচনা করেছেন। তবে এর অনেক কিছুই আর বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। তার পোয়েটিক্স বা কাব্যতত্ত্ব সাহিত্যতত্ত্বের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তারকারী গ্রন্থ। প্রায় দুই হাজার বছর ট্রাজেডি নাটকের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণে এই গ্রন্থ তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থান ধরে রেখেছিল।

দর্শনশাস্ত্রের এই তিন মহারথীর পর গ্রীসে আরো বেশ কিছু দার্শনিকের সরব উপস্থিতি আমরা দেখলেও এঁদের সমতুল্য কাউকে পাওয়া যায় না। এঁদের পরবর্তী দার্শনিকদের মধ্যে স্টোয়িসিজম বা ঔদাসীন্যবাদের প্রবক্তা জেনোর নাম উল্লেখযোগ্য। সিটিয়ামের অধিবাসী তিনি। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ সালের দিকে এথেন্সে শিক্ষকতাও করেন। জেনোর মত হলো, মানুষের ভালো-মন্দ সব পরিস্থিতির কারণ প্রকৃতির মধ্যেই নিহীত থাকে। কাজেই এর বাইরে মানুষ চেষ্টা-তদরীর যাই করুক না কেন ব্যতিক্রম কিছুই সে ঘটাতে পারবে না। জেনোর বিখ্যাত গ্রন্থ *রিপাবলিক*। এটি প্লেটোর *রিপাবলিকের* অনুকরণে লেখা। তবে এই গ্রন্থের অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। কিন্তু স্টোয়িসিজমের ধারণা এই বইতেই জেনো বিধৃত করেছিলেন। জেনোর স্টোয়িসিজম বা ঔদাসীন্যবাদের প্রভাব পরবর্তীতে অনেক সাহিত্যিকের কর্মে দৃশ্যমান হয়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এপিক্টেটাস, সেনেকা, উইলিয়াম শেক্সপীয়র প্রমুখ।

যা'হোক, ৩২২ খ্রিস্টাব্দে এরিস্টোটলের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গ্রীক ক্লাসিসিজম বা ধ্রুপদী সাহিত্যের যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর মেসেডোনিয়ার রাজা ফিলিপ এবং তার পুত্র আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এর রাজ্যবিস্তারী তৎপরতার কারণে এথেন্সের অবস্থানের অবনতি ঘটে। সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র সরতে থাকে এবং তা গিয়ে সাময়িকভাবে থিতু হয় মিশরের আলেজান্দ্রিয়ায়। খ্রিস্টপূর্ব তিন শতকে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রীক সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং বিশেষ করে ইহুদী পণ্ডিতদের আকৃষ্ট করে। কালক্রমে এটি ইহুদী জনসমষ্টির মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সঙ্গে স্থাপিত হয় জাদুঘর ও লাইব্রেরী। যেখানকার বইয়ের সংগ্রহ ছিল পাঁচ লাখেরও বেশি। বইগুলোর প্রায় সবই গ্রীক ভাষায় রচিত ছিল।

তারপরও গ্রীক সাহিত্যের চর্চা থেমে যায়নি। খ্রিস্টপূর্ব তিন শতকেই থিওক্রিটাস, ক্যালিম্যাকাস ও এপোলোনিয়াস প্রমুখ কবি গ্রামীণ প্রেক্ষাপটকে বিষয়বস্তু করে কাব্য রচনা করেন। এপোলেনিয়াস *'আর্গোনোটিকা'* নামে মহাকাব্যও রচনা করেন। তিনি তের বছর আলেকান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীতেও কাজ করেন। ক্যালিম্যাকাস তাঁর শোকগাঁথা বা এলিজি 'ইটিয়া'র জন্য উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছেন। থিওক্রিটাসও মহাকাব্য ও গীতিকবিতা রচনা করেছেন। তবে এগুলোর বেশির ভাগই এখন আর টিকে নেই।

এরপরে রোমান সাম্রাজ্যের দ্রুতবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক সাহিত্যের কেন্দ্রচ্যুতি ঘটে। রোমান সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গসৌষ্ঠব্য বৃদ্ধি পায় দ্রুতগতিতে। তবে এ-কথা স্মার্তব্য যে, রোমান সাহিত্য এবং পরবর্তীতে ইংরেজি সাহিত্যের, তথা বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব্য বৃদ্ধিই শুধু নয়,এর মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের ক্ষেত্রে গ্রীক সাহিত্যে, সংস্কৃতি, দর্শন ও ধ্যানধারণার ভূমিকা অপপনেয়, অনস্বীকার্য। সেনেকাই হোক আর শেক্সপীয়রই হোক বা জেমস জয়েসের কথাই বলুন– এঁদের চিন্তা-চেতনা ও মননের ভিত্তিমূলে প্রোথিত আছে গ্রীক সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের নির্যাস। এমনকি আধুনিক কালের মাথা ঘুরিয়ে দেয়া ইউরোপীয় তাত্ত্বিক বা পণ্ডিত ব্যক্তি তা সে সিগমান্ড ফ্রয়েডই হোন,আর নিৎসেই হোন– এঁদের মধ্যে কমবেশি উদ্দীপনা ও উদ্যম ছড়িয়েছে গ্রীক দর্শন, সাহিত্য ও সস্কৃতি।

সহায়ক গ্রন্থ

এলহাম হোসেন, *ইংরেজি সাহিত্যের গল্পকথা*, বিদ্যানুরাগ, ঢাকা, ২০০০।

মোবাশ্বের আলী, *গ্রীক ট্রাজেডি*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১৭।

ভট্টাচার্য, ড. সাধন কুমার, *এরিস্টটলের পোয়েটিক্স্ ও সাহিত্যতত্ত্ব*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৭